দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 14 JUN 2017
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

আবদুল মান্নান

আমার স্কুল

'আমার ইশকুল' শিরোনামে আজকাল কীর্তিমান তথা সফল ব্যক্তিরা লিখে থাকেন। ব্যক্তি, সমাজ বা শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির নানা দিকে যারা স্ব-প্রতিভাবলে ভাস্বর ও আলোকিত হন, তারা অতীত স্মৃতিচারণের মাধ্যমে তাদের বেড়ে ওঠার গল্প বলে থাকেন। পত্রিকার পাতায় প্রকাশিত হলে এটি নানা শ্রেণির পাঠকের দৃষ্টি কাড়ে। হলফ করে বলতে পারি, আমি এ দলের নই। বরং একজন প্রাক্তন ছাত্রের প্রথম বিদ্যাপিঠের বাস্তব চিত্রের গ্রামীণ উপাখ্যানমাত্র।

আমার স্কুল নিয়ে দু-একটি কথা বলতে চাই। সম্প্রতি শুনেছি প্রাক্তন ছাত্রদের উদ্যোগে গ্রাম-বাংলার একেবারে সাধারণ সাদামাটা হাই স্কুলটির সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করা হবে। তাদের প্রস্তুতির কথা আমাকে জানানোর কারণে তাৎক্ষণিকভাবে এই তাগিদ অনুভব করি।

কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদী উপজেলাধীন মুমুরদিয়ায় অবস্থিত চাতল বাগহাটা হাই স্কুল। প্রাইমারি ও জুনিয়র স্কুল হিসেবে এর যাত্রা শুরু হয় গত শতাব্দীর পাঁচের দশকে। বঙ্গভঙ্গের সময় জনৈক অভয় দত্ত তাদের নিজের জমির ওপর প্রাথমিক পর্যায়ে স্কুলটি চালু করেন। ষাটের দশকের শেষ দিকে এসে স্কুলের স্থান পরিবর্তনসহ চাতল স্কুল একটি পূর্ণাঙ্গ হাই স্কুল হিসেবে পথ চলা শুরু করে। জানা যায়, দত্ত পরিবারের অধিকাংশ সদস্যই ১৯৪৭ সালের দেশভাগের সময় ভারতে চলে যান। কেউ কেউ ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের আগে ও পরে যান। পরবর্তী সময়ে তাদের বাড়িসংলগ্ন পারিবারিক সম্পত্তির ওপরই স্কুলটি স্থানান্তরিত হয়ে আসে। উল্লেখ্য, সেই দত্ত বংশের উত্তরাধিকারী জনৈক দেবব্রত দত্ত 'স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া'র কর্মকর্তা। কিছুদিন আগেও তিনি ঢাকায় পদায়নকৃত ছিলেন। তার একান্ত আগ্রহে এ স্কুলে তাদের পূর্বপুরুষের নামে সম্প্রতি একটি বৃত্তি চালু করা হয়, যা অব্যাহত রয়েছে। উল্লেখ্য, দেবব্রত দত্তের পিতা কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক ছিলেন বলে জানা যায়।

বর্তমান অবস্থানে এসে এখন সারা দেশের অনুরূপ এটি স্কুল অ্যান্ড কলেজে উন্নীত হয়েছে। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান তথা স্বাধিকার আন্দোলনের সময় বাঙালি জাতির এক গৌরবোজ্জ্বল ও ঐতিহাসিককাল পর্বে এ স্কুল থেকে প্রথম ব্যাচের ছাত্ররা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়। প্রথম বর্ষেই স্কুলটি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করে। বলা বাহুল্য, জুনিয়র পর্যায়ে অসংখ্য কীর্তিমান ব্যক্তি এ স্কুলের ছাত্র ছিলেন। অনেকের মধ্যে একসময়ের কংগ্রেস নেতা, রাষ্ট্রদূত এবং স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম আইন ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী বাবু শ্রী মনোরঞ্জন ধরকে স্মরণ করা যায়। হাই স্কুল সময়ে পড়ুয়া দু-চারজনও পার্থিব জীবনে বড় সফলতা পেয়েছেন। চাকরি জীবনেও পেয়েছেন তারকাখ্যাতি এবং বিপুল পরিচিতি।

নবযাত্রায় স্কুলটি পেয়েছিল একঝাঁক স্থানীয় সৎ, সাহসী, বিবেকবান, বিদ্যোৎসাহী মানুষ। যাদের কেউ জনপ্রতিনিধি, কেউ শিক্ষক, ছাত্র ও সংস্কৃতিকর্মী। হাই স্কুল হওয়ার শুরুতে ইদ্রিছ আলী নামে একজন যোগ্যতাসম্পন্ন প্রধান শিক্ষক ছিলেন। শিক্ষকসুলভ মেধা-মননে তার সুখ্যাতি ছিল। শুরু শৈশব-কৈশোর কাটে পাড়াগাঁয়ের এ বিদ্যালয়ে। এ স্কুলের মাটির সঙ্গে যেন মিশে আছে আমার অস্থিমজ্জা। আমার অস্তিত্ব। আমার বেড়ে ওঠা।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকে স্কুলটি ঘুরে দাঁড়াতে থাকে। দূর-দূরান্ত থেকে অপেক্ষাকৃত ভালো ছাত্ররা ভর্তি হতে থাকে। বিজ্ঞান বা বাণিজ্য শাখা না থাকলেও প্রধান শিক্ষকের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, শিক্ষকদের আন্তরিকতা, আগ্রহ ও পরিশ্রমের কারণে অসংখ্য মেধাবী ছাত্র বিজ্ঞান পড়ার আগ্রহ বর্জন করে অষ্টম শ্রেণির পরও এ স্কুলেই থেকে যায়। ইতোমধ্যে শাম্ভু স্যার গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রিপ্রাপ্ত হয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ অলঙ্কৃত করেন। সঙ্গে রাখেন তারই প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধা একটি গ্রুপকে। তাদের কেউ কেউ শিক্ষকতা করেছেন গুরুর নির্দেশে তারই আজ্ঞাবহ হয়ে। সে সময়ের কয়েকজন শিক্ষককে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা যায়। শ্রী দুলাল চন্দ্র সরকার, অবনী কান্তি রায়, গোপালচন্দ্র সূত্রধর, সুনীল পাল, অনিল সরকার, পাঠান সাহেব, মৌলানা আব্দুল বারী, সেলিম উদ্দিন, আব্দুল জব্বার, শাহ মতিয়ুর রহমান, মুহাম্মদ আশরাফ উদ্দিন, সদ্য প্রয়াত শাহ সেকান্দর আলী প্রমুখ।

গোপালবাবু মধ্য বয়সে এসে ব্যাংক কর্মকর্তা হয়ে স্কুলের চাকরি ত্যাগ করেন। অসাধারণ প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদ মানুষটি সারা জীবন দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন। চাকরিতে থাকা অবস্থায় দীর্ঘ অসুস্থতার পর অকালপ্রয়াত হয়েছেন। আমাদের ছাত্রজীবনে গল্পের মতো শুনতাম, স্কুলের প্রধান শিক্ষক যে চেয়ারটিতে বসতেন (সম্ভবত এখনো আছে) চেয়ারটি গোপাল সূত্রধরের হাতে তৈরি করা। তিনি বেতনের পরিবর্তে চেয়ার বানিয়ে দিয়েছিলেন।

অবনী কান্তি রায় স্বাধীনতা-উত্তরকালে সপরিবারে স্বদেশ ত্যাগ করে ভারতে চলে যান। এলাকায় জনশ্রুতি ছিল অবনী স্যারের পেছনে হাঁটলে শোনা যায়, তিনি নিরন্তর পথ হেঁটে চলেছেন আর পাটিগণিতের হিসাব মিলাচ্ছেন। কী মায়াবী সাধনা এবং একাগ্রতা ছিল একজন শিক্ষকের পেশাদারিত্বে। কোনো ছাত্র অঙ্ক না বুঝলে হাতে থাকা ডাস্টার দিয়ে মাথায় ছোট্ট করে আঘাত করতে করতে বলতেন, 'লেখা নাই, পড়া নাই করি আমি কি, লাইট্টা জামাই আমার সোনা ধরি ঝি'। তখন কি আমরা বুঝতে পারতাম এই কালজয়ী ছন্দের মর্মার্থ বা অন্তর্নিহিত তাৎপর্য? আহা! কী বাণী-অর্চনা। কী নান্দনিক ভর্ৎসনা, অপূর্ব গুরুদক্ষিণা।

আমার স্কুলটি আজও সে স্থানেই দাঁড়িয়ে আছে। আগের তুলনায় অনেক উজ্জ্বল বর্ণে শোভিত অট্টালিকায় ঘেরা নিরাপদ বলয়ের অভ্যন্তরে শ্রেণিকক্ষ পূর্ণ করা ছাত্রছাত্রীদের কলরবে হয়তো প্রাণবন্ত একটি বিদ্যায়তন। স্থানীয় অভিভাবকদের আগ্রহ ও প্রচেষ্টায় কয়েক বছর আগে একই নামে পাশেই গড়ে উঠেছে ইন্টারমিডিয়েট কলেজ। শুনেছি এখন ছাত্রের তুলনায় ছাত্রীদের আধিক্য। নারী শিক্ষায় ক্রম অগ্রসরমান আমাদের বাংলাদেশের এটি আজকের বাস্তব চিত্র।

নব নব অবকাঠামোয় ক্রমাগত বর্ধিত হয়ে উঠেছে স্কুলের অভ্যন্তরীণ অবয়ব। বেড়েছে সৌন্দর্য। সরকারি এবং ব্যক্তি অনুদান বা অর্থানুকূল্যে নানাবিধ শিক্ষা সরঞ্জাম পাওয়া যাচ্ছে। শিক্ষাদানোপযোগী আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারযোগ্য যন্ত্রপাতিসহ আরও কত কিছু পাওয়া যাচ্ছে এখনকার স্কুলগুলোয়। এখন হাত বাড়ালেই সব আছে। অথচ সেই এ.টি দেবের ডিকশনারি মুখস্থ করা ইংরেজির শিক্ষক অনিল সরকারের মতো পেশাদার নিবেদিতপ্রাণ বিদ্যাসাগররা কি আমার স্কুলে আছেন? না কি অন্তঃসারশূন্য সুদৃশ্য ভবনসর্বস্ব উন্নয়নচিত্রই আমার স্কুল? জানি না গ্রাম-বাংলার এসব স্কুল আবার কবে ফিরে পাবে এদের সোনালি অতীত! প্রত্যয়ী সাধনার যুগ। তবু আমাদের স্কুলটি বেঁচে থাক সাবেক ছাত্রদের প্রবল অনুভূতি আর গভীর প্রেরণার ঐশ্বর্য হয়ে।

নব নব অবকাঠামোয় ক্রমাগত বর্ধিত হয়ে উঠেছে স্কুলের অভ্যন্তরীণ অবয়ব। বেড়েছে সৌন্দর্য। সরকারি এবং ব্যক্তি অনুদান বা অর্থানুকূল্যে নানাবিধ শিক্ষা সরঞ্জাম পাওয়া যাচ্ছে। শিক্ষাদানোপযোগী আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারযোগ্য যন্ত্রপাতিসহ আরও কত কিছু পাওয়া যাচ্ছে এখনকার স্কুলগুলোয়। এখন হাত বাড়ালেই সব আছে

❑ আবদুল মান্নান: অতিরিক্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়